ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২২

প্রাবন্ধিক হুমায়ুন কবিরের সমাজ-ভাবনা

ড. অনুপম হীরা মণ্ডল*

সারসংক্ষেপ: হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯) একজন বহুমুখি প্রতিভাবান মানুষ। তিনি একাধারে প্রাবন্ধিক, রাজনীতিক, সমাজসেবী, শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষক। কর্মবহুল জীবনের মধ্য দিয়ে তিনি উপমহাদেশের মানুষের উন্নয়নে চিন্তা করেছেন। এ বিষয়ে তিনি অনেকগুলো প্রবন্ধ রচনা করেন। এ সব প্রবন্ধে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক সংকট ও সম্ভাবনা বিষয়ে নানামুখী চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। এমনকি তিনি নিজে 'চতুরঙ্গ' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তিনি ছিলেন পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। এই পত্রিকার মাধ্যমেও তাঁর চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। দীর্ঘকাল ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক সমাজ-সচেতন ব্যক্তির রচনা 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটি এখনো প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি দীর্ঘ ৭৬ বছর পার করেছে। এটি নিঃসন্দেহে বাংলা পত্রিকা প্রকাশের ইতিহাসে একটি বিশেষ ঘটনা। দীর্ঘ ৭৬ বছর পত্রিকাটি বাঙালির চিন্তন-মননের খোরাক জুগিয়ে এসেছে। এর প্রচ্ছদে এখনো কৃতজ্ঞতা স্বরূপ প্রতিষ্ঠাতার নাম স্মরণ করা হয়। কেবল পত্রিকা প্রকাশ নয় সাহিত্য সাধনা, রাজনীতি, সমাজ-ভাবনায় তিনি এখনো বাঙালির কাছে স্মরণীয় এবং অনুকরণীয়। বর্তমান প্রবন্ধে হুমায়ুন কবির রচিত প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করে তাঁর সমাজ-ভাবানার স্বরূপ নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

হুমায়ুন কবিরের জন্ম ও কর্মজীবন:

হুমায়ুন কবির-এর জন্ম ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেলার কোমরপুর গ্রামে। সময়টি বাঙালিদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এক বছর আগেই বঙ্গবিভাগ ঘোষণা হয়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুলাই লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভক্তির ঘোষণা দেন। ঠিক একমাস পর অর্থাৎ ৭ আগস্ট কলকাতা টাউন হলে বিদেশী বিশেষ করে ব্রিটেনের মালামাল বর্জনের দাবি ওঠে। এ সময় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে গণবিক্ষোভ প্রদর্শিত হতে থাকে। বরিশাল বি.এম. কলেজ, বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানে জনসভা ও বিক্ষোভ হয়। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে বঙ্গবিভাজন রদ করার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১] হুমায়ুন কবীরের জন্ম এমন একটি সময়ে যখন বাঙালি ব্রিটিশভারতে প্রতিনিধিত্বশীল একটি জাতি হিসেবে পরিচিত। আবার সরকারি সুযোগ ভোগের ক্ষেত্রেও বাঙালি ছিল এগিয়ে। একই সঙ্গে তখন ব্রিটিশ রাজের বিরোধিতার জন্য যে আক্রোশ নেমে আসে তার সিংহভাগ নিপীড়ন সহ্যকরতে হয় বাঙালিদের। একই সময় প্রশাসনিক সুবিধার দোহাই দিয়ে ব্রিটিশরাজ বাংলাকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র করে। বাংলা যেমন ভূমির দিক থেকে খণ্ডিত হয় তেমনি বাঙালি মানসিক দিক দিয়েও বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। হুমায়ুন

*সহকারী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

কবিরের জন্ম বাংলার এই ভূমি-খণ্ডনের মানচিত্রের মধ্যে। এ কারণে তাঁর চিন্তনজগতে বাংলা অঞ্চলের মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়েছে। কিন্তু তিনি তথাকথিত বাঙালি বুদ্ধিজীবী কিংবা রাজনীতিকের মতো চিন্তা করেননি। তাঁর চিন্তা ও কর্মে তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের থেকে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। তাই হুমায়ুন কবির বর্তমান কালেও অধ্যয়নের বিষয় হয়ে ওঠেন।

হুমায়ুন কবিরের পিতা ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি ব্রিটিশের প্রদত্ত খান বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। নাম খান বাহাদুর কবিরুদ্দিন আহমদ। হুমায়ুন কবিরের জন্ম ফরিদপুরে হলেও পিতার কর্মসূত্রে তিনি নওগাঁ'র কৃষ্ণধন বাগচী স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজিতে লেটারসহ প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। এর পর পড়তে যান কলকাতায়। কলকতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজিতে লেটারসহ আই.এ.-তে প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এরপর ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বি.এ. অনার্স এবং ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে সরকারি বৃত্তিতে ইংল্যাণ্ড যান। অক্সফোর্ড থেকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে দর্শন, ইতিহাস ও অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন। এ সময় তিনি অক্সফোর্ড ইউনিয়নের সেক্রিটারি নির্বাচিত হন। ১৯৩২ ও ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক হিসেবে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হকের রাজনৈতিক সচিব হিসেবে যোগ দেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব হন। একে একে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রান্ট কমিশনের চেয়ারম্যান, শিক্ষাসচিব, বেসামরিক বিমান চলাচল প্রতিমন্ত্রী, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের কেবিনেট মন্ত্রী এবং অবশেষে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[২]

১. হুমায়ুন কবিরের সমাজ-ভাবনা:

হুমায়ুন কবিরের জীবন ছিল কর্মবহুল। তিনি সারাজীবন ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সঙ্কট নিয়ে ভেবেছেন। এই সঙ্কট থেকে উত্তরণের নানা পন্থা আবিষ্কার করেন। এ সম্পর্কে রাজনৈতিক-সামাজিকভাবে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। সর্বোপরি তাঁর চিন্তা ও কর্মের মধ্যে প্রশাসনিক কর্তাদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা ছিল। অন্তত তাঁর প্রবন্ধগুলো পাঠ করে এমনই ধারণা পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধগুলোর মাধ্যমে হুমায়ুন কবিরের চিন্তা ও কর্মের একটি সমগ্রতা নির্মাণ করা যায়। মোটাদাগে তাঁকে আবিষ্কার করতে গেলে তাঁর লেখনীকে আশ্রয় করতে হয়। সেই সঙ্গে তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে সমকালীন ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে হুমায়ুন কবিরের অবস্থান সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

হুমায়ুন কবির ব্যক্তিজীবনে অখণ্ড ভারতের চিন্তা করেছেন। তাঁর সময়ে সিংহভাগ মুসলিম সম্প্রদায় এই ভাবনার সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করতে পারেনি। তবে তাঁর চিন্তার সঙ্গে যে মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন মুসলিম ব্যক্তিত্ব সংহতি প্রকাশ করেননি তা নয়। তবে সে সংখ্যা এতই নগণ্য ছিল যে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তুলনায় তা চোখে পড়ার মতো ছিল না। তিনি যে সময় অখণ্ড ভারতের কথা চিন্তা করছেন ঠিক সেই সময় বাঙালি হিন্দু-মুসলমান পরস্পর নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে মত্ত। এমনকি তারা তাদের ধর্মীয় পরিচয়কে তুলে ধরে নিজেদের রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ফল হিসেবে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী তাদের ধর্মীয় বিভাজনের বিচারে দুইটি রাষ্ট্র গঠন করে। এই বিভাজন রেখায় স্পষ্ট প্রতিবাদী হুমায়ুন কবীর চললেন অখণ্ড ভারত চিন্তার পথ ধরে। যখন বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় পাকিস্তানের দিকে পা বাড়িয়েছে, হিন্দু আত্মতৃপ্ত হিন্দুস্থান কায়েম করে ঠিক সেই সময় হুমায়ুন কবীর অখণ্ড ভারতভূমির স্বপ্ন দেখলেন। যে মানসিক জোর, স্পষ্টবাদী কথন আর সুনির্দিষ্ট অবস্থানের জন্য তিনি এটি করতে পেরেছিলেন তা আজও স্মরণীয়।

অখণ্ড ভারতবোধের এই মানুষটিকে কোনো নির্দিষ্ট ছকে বেঁধে ফেলা দুষ্কর। তাঁকে কেবল প্রাবন্ধিক বললে যথার্থ বলা হয় না। তিনি একাধারে রাজনীতিক, জনপ্রতিনিধি, সমাজ গবেষক, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ইত্যাদি। নানা অভিধায় তাঁকে অভিহিত করা যায়। সবগুলো ক্ষেত্রেই তাঁর সমান পদচারণা ঘটেছে। সেই পদযাত্রায় তিনি সফলভাবে গন্তব্যেও পৌঁছেছেন। তাই একটি নির্দিষ্ট অভিধায় অভিহিত করা খণ্ডিত হুমায়ুনকে চেনামাত্র। তবুও লেখনীর মধ্যদিয়ে তাঁকে আবিষ্কার করতে গেলে তাঁকে প্রাবন্ধিক অভিধায় অভিহিত করাই যৌক্তিক বলে মনে হয়।

সমাজচিন্তক হুমায়ুন কবিরকে বাঙালির জাতিভেদ এবং সাম্প্রদায়িকতার রূপ বার বার ভাবিত করেছে। বিশেষ করে বাঙালি হিন্দু-মুসলিম বিভেদ তাঁকে বিচলিত করে। এই দুই সম্প্রদায়ের অনৈক্য তাঁকে বিপর্যস্ত করে তোলে। তিনি বার বার সম্প্রদায় দুটির অনৈক্যের ঐতিহাসিক রূপ নিরূপণ করার চেষ্টা করেন। আন্তরিকতার সঙ্গে এর সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেন। তিনি দেখেছেন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এই দুটি সম্প্রদায়ের সদ্ভাব ব্যতিরেকে ভারতের জাতীয় কল্যাণ সম্ভব নয়। সম্প্রদায় দুটির ঐক্য ছাড়া ভারতের জাতীয় চরিত্রে শান্ত ও ধীশক্তির অবস্থান অসম্ভব। ভারতবাসীর মধ্যে বহুজাতি-সম্প্রদায়-ধর্মের ঐক্যে একটি অখণ্ড-ভারতবাসীর স্বপ্ন দেখেছেন। তাই তিনি সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে ছাপিয়ে উঠতে চেয়েছেন। বার বার বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে বাংলার ভেদনীতি হবে ভারতের স্বাধীনতা অন্দোলনের খণ্ডিত রূপ। সাম্প্রদায়িকতার রোষানল জ্বলতে থাকলে ভারতীয়দের চরিত্রে যেমন স্থিতাবস্থা লাভ করতে পারবে না তেমনি অখণ্ড ভারতের কল্পনা করা অসম্ভব হবে। ঠিক তাঁর এই আশঙ্কা সত্যি হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত বিভক্তির পর।

হুমায়ুন কবিরের জন্ম সালেই ভারতের মুসলমানদের অধিকার রক্ষায় বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় হতে 'মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক প্লাটফর্ম গড়ে ওঠে। এই প্লাটফর্ম থেকে প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানদের পশ্চাদপদতার কারণ অনুসন্ধান করা হয়। এই দলের নেতৃবৃন্দ দেখেন যে মুসলিম সম্প্রদায়কে এগিয়ে নিতে গেলে ব্রিটিশ শাসকের বিরোধিতা নয় বরং তাদের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সম্প্রদায়কে সুযোগ সুবিধা ভোগ করেতে হবে। কারণ ভারতীয় হিন্দু ভারতীয় মুসলমানদের থেকে যতোটা এগিয়ে আছে তা যথেষ্ট ঈর্ষণীয়। ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়কে আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে নিতে গেলে রাজ ক্ষমতার সঙ্গে আপোস-রফা করতে হবে। তবেই সম্প্রদায়ের উন্নতি সম্ভব। ততদিনে ভারতীয় কংগ্রেস দেশে স্বরাজের ডাক দিয়েছে। যখন ভারতীয় মুসলিম লীগ স্ব-সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় রাজপৃষ্ঠপোষকতার প্রত্যাশী তখন ভারতীয় কংগ্রেসের স্বরাজের আহ্বান হুমায়ুন কবিরকে বিচলিত করে। তিনি মনে করেন এই স্বরাজ পেতে হলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে হবে। তিনি অনুভব করেন এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির সম্বন্ধ ছাড়া দেশের স্বাধীনতা অসম্ভব। তাই তিনি বলেন—

> কেহ কেহ আজ বলিতেছেন যে হিন্দু তাহার একার-সাধনায় স্বরাজ অর্জন করিবে, মুসলমানের সাহায্যের প্রয়োজন নাই। হিন্দুর একার চেষ্টায় ইংরেজের বিপুল শক্তি ক্ষুণ্ন করিয়া স্বাধীনতা অর্জন সম্ভবপর কিনা সে কথা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহারা ভুলিয়া যান যে ভেদ-নীতি শাসনের একটি মূলনীতি। ইংরাজ যদি কখনও মনে করে যে হিন্দু তাহার একার চেষ্টায় স্বরাজ লাভ করিতে পারে, তবে যে সে নিশ্চয়ই মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে প্রয়াস পাইবে এবং কিয়ৎ পরিমাণে সফলও হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।[৩]

ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান একে অপরকে এড়িয়ে চলার মানসিকতা এক দিনের নয়। এটি এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক মানসিকতার ফল। তবে এই মানসিকতা নিয়ে হিন্দু যেমন নিজেদের অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি তেমনি মুসলিম সম্প্রদায়ও হিন্দুকে পাশ কাটিয়ে বেশি দূর যেতে পারেনি। কারণ একে অন্যকে অস্পৃশ্য জ্ঞানে অবহেলা করলেও তারা উভয়েই ব্রিটিশের রাজ্যে পরাধীন। এই পরাধীন দেশে অধিকারহীন পরিবেশেও তারা মিলনের পথ অনুসন্ধান করেনি। বরং অতীতের আক্রোশ আর ঘৃণার আগুনে তেল ঢালতে থাকে। অতীতের জঞ্জালগুলো ঘেটে পুঁতিগন্ধ বের করে। এর ফলে ইংরেজের বিরুদ্ধে সমবেত অসহযোগিতা তৈরি না হয়ে নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের জন্ম দেয় । এই সংঘাতের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে হুমায়ুন কবির উল্লেখ করেন—

> ...সকল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সবচেয়ে মূল কারণ বোধহয় সামাজিক গোঁড়ামী। এ বিষয়ে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই সমান দোষী। হিন্দু সমাজ তাহার নিজেদের গণ্ডির মধ্যে সহস্র বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষকে মানুষের অধিকার দিতে চায় নাই, মানবতার বিরুদ্ধে ইহার চেয়ে বড় অপরাধ বোধ হয় আর কিছুই নাই। মুসলমানকেও সে অস্বীকার করিয়াছে, অপবিত্র যবন বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিতে চাহিয়াছে, তাহার সংস্পর্শকে

> সর্বতোভাবে এড়াইয়া আপনার শুচিতা বাঁচাইয়া চলিতে চাহিয়াছে।... ঠিক তেমনি মুসলমানও হিন্দুকে কাফের বলিয়া দূরে ঠেলিতে চাহে। মুখে সাম্য ও মৈত্রীর গর্ব করিলেও সে হিন্দুকে সাধারণ নাগরিক অধিকার দিতে স্বীকৃত নহে। তাহার মন্দিরকে সে অবজ্ঞা করে, তাহাদের দেবদেবীকে সে ঘৃণার চক্ষে দেখে।[৪]

ঐতিহাসিক এই সত্যকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ একেবারে অস্বীকার করতে পারেনি। তাই যখন কংগ্রেস স্বরাজের ডাক দেয় তখন মুসলিমলীগ ব্যস্ত থাকে তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি রাজানুকূল্য পাওয়ার জন্য। এই ভেদনীতিকে ফিরিঙ্গি রাজ ব্যবহার করে। তাদের শাসনের নীতি হিসেবে ভেদনীতিকে আশ্রয় করে এবং দুই সম্প্রদায়কে ধর্মীয় পরিচয়ে বিভক্ত করার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে। তারা ভারত ত্যাগের পূর্বে ভারত-পকিস্তান নামে দুইটি বিষবৃক্ষ রোপণ করে। যা অখণ্ড ভারতবাসীর চিন্তকদের আজও পীড়া দেয়। এই যন্ত্রণা থেকে হুমায়ুন কবিরও মুক্ত থাকতে পারেননি। তাই তিনি পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে আবাস গড়েন। কারণ তিনি অখণ্ড ভারতের কল্পনা করেছেন। মুসলমানের জন্য আলাদা রাষ্ট্র আর হিন্দুর জন্য আলাদা রাষ্ট্রের কল্পনা তাঁর মস্তিষ্কগত নয়। তিনি যা বিশ্বাস করেছেন কর্মক্ষেত্রেও সেই বিশ্বাসের প্রমাণ রেখেছেন। ফলে মুসলমানের রাষ্ট্র পাকিস্তানে তাঁর থাকা হয়নি।

ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি দেখেছেন সাম্প্রদায়িক সমস্যা স্থায়ী আসন গেড়েছে। এর কারণ হিসেবে মধ্যবিত্তের মনোবৃত্তিকে দায়ী করেছেন। তিনি মনে করেন ভারতীয় জনগণের মূল সমস্যা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সমস্যা হলেও সেই সমস্যাকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কখনো গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেনি। হিন্দু এবং মুসলমানের সমস্যা হিসেবে যা সামনে আনা হয় তার মধ্যে আছে মধ্যবিত্ত মানসিকতা। হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর মধ্যবিত্ত নিজেদের সমস্যাই কেবল চিন্তা করেছে। অথচ দেশের সিংহভাগ জনগোষ্ঠী অত্যন্ত দরিদ্র। এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমানের সমস্যাগত কোনো প্রভেদ নেই। শ্রেণী হিসেবে তাদের পরিচয় অভিন্ন, তারা হলো 'দরিদ্র' শ্রেণী। তাই তিনি মনে করেন, ভারতবাসীর সমস্যা দূর করতে হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য, বস্ত্রের সংস্থান করতে হবে। এখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্যাকে গুরুত্ব দিতে হবে। কাউকে ছেড়ে কারো সমস্যার সমাধান চিন্তা হলো সুবিধাবাদীদের চিন্তা। এর মধ্যে হিন্দুর সমস্যা বা মুসলমানের সমস্যা সমাধানের চিন্তা নেই, আছে সুবিধাবাদী শ্রেণীর ভাগবাটোয়ারার চিন্তা। তাই মুসলিমলীগ যখন ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন তখন তিনি বলেন এটি হলো নবজাগ্রত মুসলমান মধ্যবিত্তের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্তের স্বার্থ-সংঘাত। এর সঙ্গে তিনি দরিদ্র মুসলমানের স্বার্থে যেমন কোনো সংযোগ দেখতে পাননি তেমনি দরিদ্র হিন্দুর সঙ্গে মধ্যবিত্ত মুসলমানের কোনো দ্বন্দ্ব দেখেননি।

বাংলার নেতৃত্ব হিন্দু মধ্যবিত্তের হাতে ছিল তাই মুসলমান মধ্যবিত্ত কিংবা চাষী মজুরের সমস্যা তাদের নিকট বড় হয়ে দেখা দেয়নি। এদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টাতো হয়নি বরং

তাদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এ কথাও সত্য যে কেবল হিন্দু কিংবা মুসলমানের সহানুভূতি অর্জন করে সর্বভারতীয় নেতৃত্বে অবস্থান করা অত্যন্ত কঠিন। তাই যতোদিন সমগ্র জাতির সমর্থন অর্জন করার মতো উদারনৈতিক ব্যক্তিত্ব তৈরি না হবে ততোদিন সর্বভারতীয় নেতৃত্ব তৈরি হবে না। তাই সংখ্যগুরু মুসলমানের জনপ্রতিনিধি কিংবা সংখ্যগুরু হিন্দু অঞ্চলের জনপ্রতিনিধির মধ্যে মহৎ নেতৃত্ব, সাহস ও উদারতার অভাব থাকবে এটা সত্য। আর এই সাহস, উদারতা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোর আত্মরক্ষামূলক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকবে না। এতে এক এক প্রদেশের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর কল্যাণ হলেও সর্বভারতীয় কল্যাণ সম্ভব নয়। হুমায়ুন কবিরের এই দূরদর্শী রাজনৈতিক মন্তব্য তৎকালীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে হয়।

হুমায়ুন কবিরের রাষ্ট্র বিষয়ক ধারণা এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্দেশিত একটি প্রবন্ধ হলো, 'কংগ্রেস মতবাদ'। এখানে একটি দেশের রাজনৈতিক সংগঠন এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আছে। কংগ্রেস ছাড়া আরো কিছু রাজনৈতিক সংগঠন এবং তাদের কর্মসূচি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবে তিনি আক্ষেপ করেছেন এই বলে যে সকল রাজনৈতিক সংগঠনই দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে পূর্ণাঙ্গ স্বীকার করতে দ্বিধা করে। কিন্তু ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি হলো বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করার অর্থ ভারতের ঐতিহ্যকে খণ্ডিত করে দেখা। শুধু খণ্ডিত করে দেখাই নয় এই খণ্ডিত অংশকেই সম্পূর্ণ বলে মনে করা। কিন্তু এটি যে রাষ্ট্রীয় জীবনে কতো ক্ষতিকর তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আবার এক একটি দলের নেতৃত্বের আদর্শ এবং ব্যক্তিগত ত্যাগের মানসিকতা দিয়ে সংগঠনের অন্যান্য সদস্যগণ ভারতবাসীর দুর্দশা লাঘব করার চেষ্টা করে। হুমায়ুন কবির মনে করেন এটি হলো ভ্রান্তনীতি। তিনি মনে করেন—

> স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিকদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যবস্ত্র আবাস পথঘাট ও শিক্ষা স্বাস্থ্যের আজো অভাব। তাই স্বাধীনতা লাভের পরে সেই ব্যবস্থা করাই ভারতবাসীর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে ব্যক্তির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্বার্থত্যাগের ভিত্তিতে আমরা যদি সেই বিপুল পরিবর্তন আনতে চাই তবে অদূর ভবিষ্যতে সফল হওয়ার বিশেষ আশা নাই।[৫]

কেবল জাতীয় রাজনীতি নয় ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কেও হুমায়ুন কবির যে মন্তব্য করেছেন তা স্মরণীয়। এই মন্তব্য কেবল সেই সময়ের জন্য নয় বর্তমান কালেও তা যথার্থ বলে মনে হয়। তিনি তৎকালীন সময়ের ছাত্ররাজনীতি নিয়ে মন্তব্য করেছেন তবে এই মন্তব্য বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও সমানভাবে প্রযোজ্য। তিনি ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পক্ষপাতী নন। তাঁর মতে, ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকাও শোভন নয়। ছাত্ররাই সক্রিয়ভাবে দেশের অনাচারের বিরোধিতা করতে পারে। তবে তিনি আবেগ আপ্লুত হয়ে ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান সমর্থন করেন না। আবেগীয় ছাত্র আন্দোলন কোনো

বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিতে পারে না। আবেগময় ছাত্র রাজনীতির মধ্যে উদ্যম থাকে, আশা থাকে কিন্তু সার্থকতা অর্জিত হয় সামান্য। তাই ছাত্রদের তিনি আবেগ তাড়িত হয়ে রাজনীতির ময়দানে নামতে নিষেধ করেন। তিনি মনে করেন সকল ছাত্রকেই দেশের রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। যেখানে বুদ্ধির স্বাধীনতা নেই সেখানে সুস্থ ছাত্র রাজনীতি থাকতে পারে না। একই সঙ্গে তিনি মনে করেন দেশের শাসকগোষ্ঠীর আচরণ ধীরে ধীরে জনকল্যাণকর না হয়ে হীনস্বার্থে নিয়োজিত হয়। তাই শাসকগোষ্ঠীর আচরণ ছাত্রদের বাধ্য করে প্রতিবাদ করতে। দেশের রাজনৈতিক অসঙ্গতি দেখে ছাত্রসমাজ স্থির থাকতে পারে না। এটা তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু সেই প্রবৃত্তিকে নেহায়েৎ অসাংগঠনিক তৎপরতার মধ্যে নিমজ্জিত করা অনুচিত। ছাত্র রাজনীতির জন্য চাই বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত কর্মধারা ও সংগঠন। অন্যথায় ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। হুমায়ুন কবিরের এই মন্তব্য কেবল ব্রিটিশ ভারতের ছাত্র রাজনীতির বিশ্লেষণ নয়। এটি সর্বকালে এবং সর্বসমাজের ছাত্রদের রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে প্রযোজ্য। তিনি কুমিল্লা ছাত্রসম্মেলনে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করে ছাত্রদের রাজনৈতিক আদর্শ সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেন। এটি ছিল ভারত স্বাধীনতার ১০ বছর পূর্বে। এ কথা বলার আর অবকাশ থাকে না যে এই সময় ছাত্রদের সম্পর্কে এই বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ উপস্থাপন যথার্থ ছিল। তবে এই প্রবন্ধ পাঠ করে হুমায়ুন কবিরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক ও সমাজ গবেষক হিসেবে নির্দেশ করা যায়। ছাত্রদের রাজনৈতিক আদর্শ সম্পর্কে তাঁর যে মত তা যেমন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি স্বাধীন ভারতবাসীও এই বিশ্লেষণ ও তাঁর মন্তব্যের গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারবে বলে মনে হয় না। হুমায়ুন কবির এই প্রবন্ধ রচনা করেন যখন শিক্ষাঙ্গনে চরম অরাজকতা চলছিল। বলা যায়, এই সময় সমগ্র ভারতের শিক্ষাঙ্গন ছিল অস্থির। এই সময় মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরিয়ে নিয়ে নবগঠিত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের হাতে সমর্পণ করা হয়। হিন্দু নেতাদের অনেকেই এর সরাসরি প্রতিবাদ করেন। এই সময় শিক্ষাঙ্গনেও এর প্রভাব পড়ে। এমনকি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার বিধানসভায় বিষয়টি নিয়ে প্রায়ই বাক-বিতণ্ডা হতো।[৬]

হুমায়ুন কবির-এর *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* নামক সংকলনটিতে পাঁচটি প্রবন্ধ রয়েছে শিক্ষা বিষয়ক। এই সব প্রবন্ধে তিনি দেশের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অলোচনা করেছেন। দেশের শিক্ষা সঙ্কট এবং শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর কিছু নিজস্ব যুক্তি ও মতামত এখানে উঠে এসেছে। তিনি ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন, এখানে দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষার সঙ্গে প্রসন্নকর কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলের মধ্যেই গুরুগম্ভীর অবস্থা লক্ষণীয়। এখানে দুঃখ-দুর্ভোগের স্তুতিগান করা যেন সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রেও সংক্রমিত হয়েছে। যেন আনন্দপূর্ণ পরিবেশে কোনো শিক্ষাগ্রহণ সম্ভব নয়। প্রাচীনকালের ভাববাদী সাধকদের মতো শিক্ষার্থীদের সাধনায় নামানো হয়। এই সাধনা যেনো দীর্ঘদিনের কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্য দিয়ে

অর্জিত হবে। এখানে আমোদ-আহ্লাদ বর্জনীয়। কিন্তু শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা গ্রহণকালে এভাবে নিরানন্দ পরিবেশের মধ্যে নিয়ে আসা তাদের জন্য জীবনীশক্তি বিনষ্টির শামিল। শিক্ষা অর্জন একটি আদর্শ বটে কিন্তু সেই আদর্শ ধারণ করতে গিয়ে জীবনে সকল প্রমোদ বর্জন করার অর্থ জীবনের অমিতানন্দকে অস্বীকার করা। ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকাজে আগ্রহ-উৎসাহ বৃদ্ধি না পেয়ে ক্লান্তি ও বিরক্তির উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। আর তাঁর মতে, ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় ঘটছেও তাই। এখানকার অনেক শিক্ষক ধর্মীয় জীবনের নিরানন্দ কৃচ্ছ্র সাধনের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনকে এক করে দেখেন। প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায়কে তেমনি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার মধ্য দিয়ে সফলতা অর্জনের আদর্শ প্রচার করেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই ধারণই গ্রথিত করেন যে শিক্ষাকালে আনন্দ-আহ্লাদ হলো বাতুলতা। এটি শিক্ষা অর্জনের অন্তরায়। এই সব শিক্ষকের আদর্শবাদী তথা অতিআদর্শিক ধ্যান-ধারণা শিক্ষার্থীদের জড়ভরতে পরিণত করে। তাদের জীবনের সকল প্রাণপ্রাচুর্য ধ্বংস করে দেয়। ফলে তারা যথার্থ শিক্ষা তো পায়ই না উপরন্তু ধীরে ধীরে তাদের প্রতিভা বিকাশে অন্তরায় হয়।

এই শিক্ষাব্যবস্থা শিশুদের জন্য কল্যাণকর নয়। কোনো প্রকার নিরানন্দ পরিবেশ কোনো শিশুর জন্য সুখকর হয় না। যেখানে শিশুর শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির পরিবেশ থাকে না সেখানে যথার্থ শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকরী বলে মনে করা যায় না। বিদ্যালয়ে যদি স্বাচ্ছন্দ্য এবং আনন্দঘন পরিবেশ গড়ে তোলা না যায় তবে শিশুর জন্য শিক্ষাঙ্গন হবে বিরক্তি ও একঘেয়ে বন্দিশালা। ফলে যা একটি শিশুর জন্য কল্যাণকর নয় তা একটি জাতির জন্যও কল্যাণকর হতে পারে না। শিশুদের মনে যদি স্বাধীন চিন্তার বিকাশ না ঘটে তবে তাদের মধ্যে সাংগঠনিক চিন্তা তৈরি হয় না। শিশুদের মধ্যে সহজাত বুদ্ধির বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে হবে। আর এই কাজটি করতে পারবেন একজন যোগ্য শিক্ষক। যদি শিক্ষকের মধ্যে যথার্থ যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা না থাকে তবে শিক্ষাও যথার্থ হয় না। একজন শিক্ষকের যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা, কর্মতৎপরতাও শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় মূলধন। শিশুদের পাঠ্যবই যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কেবল আদর্শ আর কষ্টকাঠিন্যের শিক্ষাদান শিশুদের নির্জীব করে তোলে। তাদের মধ্যে সমাজবিষয়ক কোনো চেতনার বিকাশ ঘটে না। তার বদলে শিক্ষা সম্পর্কে ভীতি তৈরি হয় এবং মনে করে এটি হলো আনন্দহীন একটি বিষয়। ফলে ধীরে ধীরে শিশুর মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ লোপ পায়। তারা নিজেদের সহযোগী কর্মী হিসেবে ভাবতে পারে না। এর ফলে এই শিশুর মধ্যে শিক্ষাঙ্গন থেকে পলায়নপর মানসিকতা তৈরি হয়।

হুমায়ুন কবির দেখেছেন ভারতবাসীদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোক শিক্ষার সুযোগ পায়। এই ভাগ্যমন্তদেরও যদি শিক্ষার পরিবেশ অনুকূল না হয় তার মতো ব্যর্থতা আর নেই। তবে তিনি শিক্ষাকে সর্বজনলভ্য করে তোলার পক্ষপাতী। তিনি মনে করেন যা কিছু কল্যাণকর তা সকল মানুষের সকল শ্রেণী, সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। গণতন্ত্রী

সমাজের মানুষের জন্য কল্যাণকর বিষয়গুলোকে সর্বজনলভ্য করাই শ্রেয়। অথচ দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। কেবল টিকে থাকার জন্যও যদি প্রাথমিক শিক্ষাকে মনে করা হয় তবে সেখানেও সর্বজনের প্রবেশ ঘটে না। আবার তাদেরও খুব কম সংখ্যক মাধ্যমিক স্তরে যেতে পারে। আর উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে যাদের প্রবেশাধিকার ঘটে তার সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। যারা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায় সেই স্বল্প সংখ্যক মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর নির্ভর করেই মূলত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা-সংকটের সমাধান খুঁজতে হয়। দেশে গণতন্ত্র যদি শক্তিশালী করতে হয় তবে সকল নাগরিককের জন্য শিক্ষার সুযোগ দেওয়া জরুরি। তিনি এটাকে রাষ্ট্রের ন্যূনতম কর্তব্য হিসেবে অভিহিত করেছেন।

তিনি শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য বেশ কিছু পরামর্শ দেন। যেমন তিনি শিক্ষকদের সম্মান বৃদ্ধির কথা বলেন। শিক্ষকের সম্মান বৃদ্ধি না হলে শিক্ষার মান বৃদ্ধি সম্ভব নয় বলে তার মত। তিনি শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির যেমন পরামর্শ দেন তেমনি রাষ্ট্রীয়ভাবে শিক্ষকদের নিয়ে স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান করার প্রস্তাব রাখেন। দেশের কর্তাব্যক্তিদের সাধারণত আমলা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিরা ঘিরে থাকে। কোনো প্রকার রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতায় শিক্ষকদের কদর নেই। ফলে সমাজে শিক্ষকদের যথেষ্ট মর্যাদার অভাব রয়েছে। শিক্ষকদের সম্মান না থাকায় তারা শিক্ষাকাজেও আগ্রহ পান না। আবার যোগ্য ব্যক্তিও এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হতে অনীহা প্রকাশ করে। শিক্ষাবৃত্তিতে স্বতন্ত্র আনন্দ ও সন্তোষ আছে সত্যি কিন্তু এই আনন্দ আর সন্তোষ দিয়ে পুরো জীবন পার করা কঠিন। এটা ঠিক যে শিক্ষকতার পেশায় যারা আসেন তারা ব্যবসায়ী, উকিল, ডাক্তারদের মতো টাকা রোজগারের পেছনে ছোটেন না। কিন্তু ভদ্রভাবে জীবন নির্বাহের সুযোগ না থাকলে কোনো মেধাবী ও পরিশ্রমী যুবক এই বৃত্তিতে আসতে আগ্রহ পাবে না। স্কুল শিক্ষকদের আবার তিনি বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলেন। যেমন, ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা, সেমিনার, শিক্ষাক্যাম্প, শিক্ষাসফর, উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ছুটির ব্যবস্থা ইত্যাদি। এতে শিক্ষকজীবন একঘেয়েমি ও অবসাদগ্রস্ততা থেকে মুক্তি পায়। তিনি মনে করেন যত দিন শিক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থার অবসান হবে না তত দিন প্রাইভেট পড়া ও টিউশনি প্রথা দূর হবে না। আর এই ব্যবস্থা দূর না হলে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসবে না। তাঁর 'মস্কোর চিঠি' নামক প্রবন্ধে পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থা বিচার করে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার দুরবস্থা তুলে ধরেন। শিক্ষার ব্যয় সঙ্কোচনের বিরোধিতা করে বলেন—

> পাশ্চাত্য জগতে সমস্ত দেশেই শিক্ষার মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়েছে। বিলেতে ১৯৪৯ সালের অর্থবিপর্যয়ের সময়ে লেবার পার্টির শিক্ষামন্ত্রী টমমিনসন সাহেব সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন যে সরকারের অন্যান্য সমস্ত খরচ কমানো যেতে পারে, কিন্তু শিক্ষাবাজেটে এক পেনী কমানো যাবে না, কারু শিক্ষার জন্য যে অর্থব্যবস্থা তাকে ব্যয় বলা উচিত নয়,—জাতির ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করবার জন্য জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার বললেই শিক্ষা বাজেটের ঠিক বিবরণ দেওয়া হয়।[৭]

হুমায়ুনের সমাজ বিশ্লেষণের একটি বিশেষ দিক হলো নারী বিষয়ক ভাবনা। এই পর্বে তিনি নারীর অবরোধবাসিনী হয়ে থাকার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। একই সঙ্গে তিনি নারী-পুরুষের সম্পর্কের যে টানাপোড়েন সেটি নিয়েও আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন ভারতবর্ষে নারী যে পঙ্গু হয়ে আছে তার কারণ নারীকে অবরোধ করে রাখা। নারী কখনো বাইরের জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেনি। কেবল নিজ বাড়ির অভ্যন্তরেই বিচরণ করেছে। সেখান থেকে সে দু'চোখ মেলে বাইরে তাকাতে পারেনি। কারণ সেখানে আছে পুরুষের খবরদারি। তাই হয় বিনয়ে না হয় বাধ্য হয়ে নারীরা পুরুষের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করতে পারেনি। এর ফলে কেবল নারী যে পঙ্গু হয়েছে তা নয় পুরুষও হয়ে উঠেছে কাপুরুষ।

২. উপসংহার

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন কবিরের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর ৪৭ বছর পরেও মনে হয় তৎকালে হুমায়ুন কবির যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন বর্তমানেও তাঁকে অস্বীকার করা যায় না। একজন যুক্তিনিষ্ঠ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সমাজ গবেষক হিসেবে তাঁর অবদান সর্বকালের। সমাজ নিরীক্ষণে তাঁর যে তীক্ষ্ণ নজর তা ব্যতিক্রম তো বটেই রীতিমতো দুর্লভ। ভারতীয় উপমহাদেশের সকল রাষ্ট্র ও জনপদের ক্ষেত্রে হুমায়ুন কবির সমাজ নিরীক্ষক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর ব্যক্তিজীবনে যেমন সফলতা অর্জন করেছেন তেমনি জাতীয় জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ আসনে আসীন হয়েছেন। একই সঙ্গে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে জাতীয় সংকট মোকাবেলা করেছেন। একজন ভারতবাসীর নিকট তিনি স্বাজাত্যবোধের তাড়নায় অধ্যয়নের বিষয় হবেন কিন্তু বর্তমান ভারতীয় নাগরিকত্বের বাইরে এসেও কোনো বাঙালি হুমায়ুন কবিরকে অস্বীকার করতে পারবে বলে মনে হয় না। যদিও তাঁকে অস্বীকারের মধ্যেও হয়তো রুটি-রুজির ভাগ-বাটোয়ারার চিন্তা যুক্ত থাকবে। অন্যথায় সেখানে অতীতের মতো মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তির দরুণ সাম্প্রদায়িক চৈতন্য ভর করবে। এর বাইরে এসে যিনি চিন্তা করবেন তার বেলায় হুমায়ুন কবিরকে অস্বীকার করা হবে আত্মচৈতন্যের বিলোপসাধন।

তথ্যসূচি:

---

১ নীতিশ সেনগুপ্ত, *বঙ্গভূমি ও বাঙালির ইতিহাস*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮) পৃ. ২৬৫

২ সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পা. *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৩) পৃ. ৪৩৯-৪৪০

[৩] মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম সম্পা. *হুমায়ুন কবির শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১১) পৃ. ১৮

[৪] তদেব, পৃ. ১৯

[৫] তদেব, পৃ. ২২৫

[৬] নীতিশ সেনগুপ্ত, *বঙ্গভূমি ও বাঙালির ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৩

[৭] তদেব, পৃ. ২৮৬